# তিরিশ বছর পর শান্তিনিকেতনে

- মাসায়ুকি ওওনিশি

সঙ্গীত ভবনের ছাত্র ছিলাম আমি, ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। পূর্বপল্লীতে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকতাম আমার স্ত্রী-র সঙ্গে। একটি সাঁওতালি দম্পতি বাস করতেন বাগানে। বাড়ীটার দেখাশোনা করতেন। তাদের সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্টতা গড়ে উঠেছিল। তখন পূর্বপল্লীর পিছন দিকটা প্রায় ফাঁকা ছিল, সেখান থেকে প্রান্তিক স্টেশনের দিকে যেতেই মাঠের ওপারে দিক-দিগন্ত দেখতে পেতাম।

সেই বাড়ীতে থেকে আমরা শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশতে লাগলাম। প্রকৃতিকে যেন পেয়েছিলাম খুব কাছেই। মনে পড়ে, রাত্রিবেলায় কারো বাড়ীতে সঙ্গীতানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর যখন আমরা জ্যোৎস্নার আলোতে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ী ফিরতাম , সরু গলিতে চলতে চলতে জুঁই ফুলের সুগন্ধে আমাদের সারা শরীর যেন মাখামাখি হয়ে যেত। কালবৈশাখী যখন আসত , তখন ঝোড়ো হাওয়ায় বেল গাছের ফলগুলো ধপ্ ধপ্ করে ছাদে এসে পড়ত। তার পরের দিন সকাল বেলায় উঠে বাড়ীর বারান্দার ঠিক সামনের মাটিতে সেই ভাঙ্গা ফলগুলো দেখতাম। আমরা সেগুলোর ঘন হলুদ রঙের শাঁস দিয়ে সরবৎ তৈরি করতাম। আর বর্ষাকালের আরম্ভে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসত। তার ছায়া বাগানের মাটির উপর খুব হাল্কাভাবে খেলা করত।

আমি বিশেষ করে ভালবাসতাম গ্রীষ্মকালের দুপুর বেলায় প্রখর রৌদ্রের মধ্যে সাইকেল করে ঘুরে বেড়াতে। রাস্তা-ঘাটে লোকজনের কোনো চিহ্ন নেই। খাঁ খাঁ মাঠের মাঝখানে রাস্তা ধরে সাইকেলে চলতে চলতে মনে হত রৌদ্র যেন মাটিতে ধাক্কা মেরে তার ভিতরে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর আমি যেন তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

সঙ্গীত ভবনে তখনো শান্তিদেব ঘোষ, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দীনাথ দত্ত প্রমুখ ওস্তাদরা ছিলেন। আমরা নানান অনুষ্ঠানে তাঁদের গান-বাজনা শোনার সুযোগ পেতাম। সেই সময় শান্তিনিকেতনে প্রায় দশ /বারো জন জাপানী ছাত্রছাত্রী ছিলেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন কলা-ভবনে , বাকি ক জন ছিলেন সঙ্গীত-ভবনে ও বিদ্যা-ভবনে। তখন বিশ্বভারতীতে জাপানী পড়াতেন মাকিনো সেনসেই। ১৯৭৮ সালের পৌষ মেলাতে আমরা জাপানীরা সবাই মিলে জাপানী চা ও মিষ্টির দোকান খুলেছিলাম। তার পরের বছর আমি সে সব জাপানী ছাত্রছাত্রীর জন্য উত্তরায়ণে শান্তিদার গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে সেই অনুষ্ঠানে গাওয়া গানের মূল কথা ও তার জাপানী অনুবাদ কাগজে পাশাপাশি লিখে সূতো দিয়ে বেঁধে খান বিশেক ছোট "program" তৈরি করেছিলাম শ্রোতাদের সুবিধার জন্যে। আমার কাছে এখনও তখনকার একখানা "program" এবং অনুষ্ঠানটির সাউণ্ড-রেকর্ডিং রয়েছে, চিরকালের স্মৃতির মত।

গত জুন মাসে তিরিশ বছর পর আবার আমি গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে। মাত্র দু দিন ছিলাম সেখানে। যাওয়ার আগে থেকেই জানতাম পুরোনো লোক বলতে বিশেষ আর কেউ নেই, সবাই চলে গেছেন। আরও শুনেছিলাম, শান্তিনিকেতনের চেহারা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। এই ক বছর কলকাতায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েও শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয় নি। এবার যাওয়াটা ঠিক করেছিলাম অনেকটা আমার পুরোনো বন্ধুদের তাগিদে।

শান্তিনিকেতনে পরিবর্তন দেখলাম সর্বত্র। সব জায়গাতে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ী। আগে যেখানে খোলা মাঠ ছিল, সে সব জায়গার চারিদিকে বেড়া দেওয়া হয়েছে।

দু-এক জন পুরোনো বন্ধুর দেখা পেয়েছিলাম। তারা কিন্তু আগেকার মতই আছেন। আমার অন্যতম বন্ধু ছিলেন নাড়ু, আনন্দীদার দ্বিতীয় ছেলে। তিনি তিরিশ বছর আগে কলা-ভাবনের ছাত্র ছিলেন। এখন সেখানেই অধ্যাপনা করেন। তিনি তখন আমাদের সাথে এমন মিশেছিলেন যে জাপানী ছাত্রছাত্রী মাত্রেই তাঁকে চিনত। তিনি এখন তাঁর বাড়ীতে সঙ্গীতের আসর বসান, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে নিয়মিত গান-বাজনা করেন।তাছাড়া তিনি তাঁর ঘরের মধ্যে সঙ্গীত সংরক্ষণের স্টুডিও তৈরি করেছেন।

সেই গান-বাজনার আসরে প্রায়ই আসেন আমার এস্রাজ ক্লাসের পুরোনো সহপাঠী বুদ্ধদেব। তিনি এখন সেরা এস্রাজ বাজিয়েদের মধ্যে একজন। ভাল ভাল ছাত্রছাত্রীও তৈরি করেছেন। তাদের দেখে মনে হল ভারতে সঙ্গীতের ধারা এমন ভাবেই অক্ষুন্ন রয়েছে -- কোনো সংস্থার দ্বারা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা নয়, উৎসাহিত ব্যক্তিদের আকাঙ্খা আর ভালবাসায়। সঙ্গীতের প্রতি তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ ও ভালবাসা দেখে সেদিন আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। ❑